অভিমত

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও বাংলাদেশ

ড. গোলাম মোহাম্মদ ভূঞা

অনেকে মনে করেন এবং বলে থাকেন যে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি স্থানান্তর উত্তম পন্থা। কাজেই চলুন, বিদেশ থেকে নতুন নতুন প্রযুক্তি আমদানি করে দেশকে প্রযুক্তির দিক থেকে সমৃদ্ধ করি, তাহলে জনসাধারণের ভাগ্য বদলে যাবে। কথাটা শুনতে ভালোই লাগে, কিন্তু অনেকে যা ভাবেন বাস্তবতা ঠিক সেরকম নয়। ধরুন, আমরা অনেক টাকা ব্যয় করে একটি অত্যাধুনিক মেশিন আমদানি করলাম যা একদিনে বিশটি কার্পেট তৈরি করতে পারে। ফলে আমাদের কার্পেটের দাম মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় আছে। আমরা খুশি। কিন্তু তিন মাস পর দেখা গেল, প্রযুক্তিতে উন্নত দেশ এমন নতুন মেশিন তৈরি করে ফেলেছে যা এক দিনে ত্রিশটি কার্পেট তৈরি করতে পারে এবং কার্পেটের গুণগত মানও আগের চেয়ে ভালো। এখন আমাদের কার্পেট বাজারে প্রতিযোগিতায় আর টিকতে পারছে না। এত টাকা ব্যয়ে কেনা যন্ত্রটির এখন কী হবে? শুধু তা-ই নয়, বিদেশ থেকে আমদানিকৃত মেশিনের যন্ত্রাংশও বিদেশ থেকে উচ্চ দামে ক্রয় করতে হবে, ফলে আমাদের তৈরি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। এভাবে, শুধু প্রযুক্তি আমদানির উপর নির্ভরশীল থাকলে বাজারের প্রতিয়োগিতায় পিছিয়ে পড়তে হয়।

কান টানলে যেমন মাথা আসে তেমনি প্রযুক্তির কথা বললেই প্রথমে বিজ্ঞানের কথা আসে। প্রযুক্তিগত টেকসই উন্নয়নের মূল ভিত্তি হচ্ছে বিজ্ঞানের উন্নয়ন। বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য প্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হলো বিজ্ঞানের উন্নয়ন।

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির পর পাকিস্তান ও ভারত দু দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ক্রমশ বদলে যায়। পাকিস্তান বহুলাংশে বিদেশী প্রযুক্তি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে আর ভারত বিদেশী প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজস্ব প্রযুক্তি উদ্ভাবনের দিকে মনোনিবেশ করে। স্বাধীনতার পর দেড় দশক পর্যন্ত বিদেশী প্রযুক্তি নির্ভরশীল পাকিস্তানের অবস্থা ভারতের চেয়ে ভালো প্রতীয়মান হলেও আজ প্রায় ৫৫ বছর পর দু দেশের প্রযুক্তিগত ব্যবধান বিশাল। ভারত আজ উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজস্ব প্রযুক্তিতে মহাশূন্যে ভূ-উপগ্রহ পাঠাচ্ছে। ২০০৮ সালে মানুষবিহীন রকেট চাঁদে পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। সত্তরের দশকের প্রথম দিকে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানোর দায়ে ভারতের প্রথম পাওয়ার রি-অ্যাক্টর নির্মাণকারী কানাডীয় কোম্পানি কাজ অসম্পূর্ণ রেখে চলে যায়। তারপর নিজস্ব প্রযুক্তিতে ভারত সেই রি-অ্যাক্টরটির কাজ সম্পন্ন করে এবং আরো কয়েকটি নতুন রি-অ্যাক্টর স্থাপন করে। ভারতে তেজস্ক্রীয় ইউরেনিয়ামের উৎস কম, থোরিয়ামের উৎস বেশি বলে থোরিয়াম জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা ভারতের জন্য সহজতর। কাজেই তারা বর্তমানে সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তিতে আরো আটটি ব্রিডার রি-অ্যাক্টর (বিশ্বে যা বিরল) তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছে। ভারত আশা করছে তারা ২০২০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করতে পারবে এবং বিশাল ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল বিদ্যুতায়নের আওতায় চলে আসবে। ফলে মাথাপিছু শক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে দেশের সার্বিক উন্নতি ঘটবে। উল্লেখ্য, আমাদের দেশও আজ ভারতের বিভিন্ন প্রযুক্তির ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এবং এই নির্ভরশীলতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভারতের এই চমকপ্রদ প্রযুক্তিগত উন্নতির মূল কারণ তাদের বিজ্ঞানের উন্নয়ন। স্বাধীনতার ঊষাকালেই ভারত অনুধাবন করে যে বিজ্ঞানের উন্নতি ছাড়া নিজস্ব টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন সম্পূর্ণ অসম্ভব। জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে তখন এ উদ্দেশ্যে একটি রাষ্ট্রীয় নীতি তৈরি করা হয়। তারা বিজ্ঞানের উন্নতির লক্ষ্যে কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে দেশীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণা করার সুযোগ সৃষ্টি করে। শুধু যে সরকার থেকেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়, তা নয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মৌলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। আজ কে না জানে টাটা ইনস্টিটিউট ফর ফান্ডামেন্টাল রিসার্সের নাম। এমন আরো অনেক গবেষণা ইনস্টিটিউট আজ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পর ভারতে বিজ্ঞানের উন্নয়ন কতটুকু ঘটেছে, নিচের দুটি উদাহরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে। গত ৪ থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত ব্যাঙ্গালোরে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফিজিক্সের ওপর ২২তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এটা প্রতি দু বছরে একবার হয় এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথমবারের মতো ভারতে অনুষ্ঠিত

হলো। প্রায় ৬০০ অংশগ্রহণকারীর অধিকাংশই বিভিন্ন দেশ থেকে আগত। বাংলাদেশ থেকে একমাত্র অংশগ্রহণকারী হিসেবে আমার সেখানে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। সেখানে এক জার্মান পদার্থবিজ্ঞানীর আলাপ হয়। জিজ্ঞেস করি, এটা কি আপনার ভারতে প্রথম সফর? তার উত্তর, 'না, আমি এই ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সে দু বছর পোস্ট ডক্টোরাল করেছিলাম।' শুনে প্রথমে অবাক হই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেশ জার্মানির লোক আজ ভারতের মতো দেশে পোস্টডক্টরাল করতে আসে! এই বন্ধুটি বর্তমানে ইংল্যান্ডের ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার স্তর আজ জার্মানি, আমেরিকার মতো উন্নত দেশের পর্যায়ে পৌঁছেছে। স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফিজিক্স সম্মেলনে শেষের দিকে 'পদার্থবিজ্ঞান ও মানবাধিকার' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় পদার্থবিজ্ঞানীরা কী করতে পারেন এবং কী করা উচিত এসব বিষয় নিয়ে বেশি আলোচনা হয়। এক ফাঁকে একজন জানালেন, মার্কিন সরকার পৃথিবীর যেসব গবেষণা প্রতিষ্ঠানে তাদের সমপর্যায়ের বা তাদের চেয়ে উন্নত মানের গবেষণা হচ্ছে তাদেরকে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করে একটা কালো তালিকা তৈরি করেছে। মার্কিন বিজ্ঞানীদের এসব গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনোরকম সহযোগিতা বা যৌথ গবেষণা না করার জন্য গোপনে জানানো হয়েছে। ভারতের টাটা গবেষণা ইনস্টিটিউটও এই তালিকার একটি। এখন অনুমান করুন, ভারতের বিজ্ঞান গবেষণার উন্নয়ন কোন পর্যায়ে রয়েছে!

টেকসই নিজস্ব প্রযুক্তির সূতিকাগার হলো নিজ দেশে বিজ্ঞানের উন্নয়ন অর্থাৎ মৌলিক গবেষণার উন্নয়ন। এর কোনো বিকল্প নেই। প্রশ্ন হলো, বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষ কীভাবে সাধন করা যায়? এ প্রশ্নের শুধু একটিই উত্তর, সেটা হলো গবেষণাকর্মের উন্নতি। আর গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে মৌলিক গবেষণা, যার কোনো বিকল্প নেই।

গবেষণার জন্য প্রথমেই চাই একটি জাতীয় গবেষণা নীতিমালা প্রণয়ন। এ নীতিমালা প্রথমে স্থির করবে আমরা আগামী ১০, ২০ বা ৪০ বছরের মধ্যে কী অর্জন করতে চাই যা আমাদের অত্যাবশ্যকীয় করণীয়গুলো কী। দ্বিতীয় পর্যায়ে হলো, আমরা কোন উপায়ে অগ্রসর হব এবং তৃতীয় পর্যায়-এর অর্থায়ন কীভাবে হবে। সরকারকেই প্রথমে এই গবেষণার গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে এবং এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু গত ৩২ বছর ধরে বিভিন্ন সরকার এসেছে কিন্তু গবেষণার ব্যাপারে তেমন কোনো অগ্রগতি চোখে পড়েনি। শিক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বড় বড় পদে নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে দু-একজন ছাড়া বাকি সবাই গবেষণা জগতের বাইরের মানুষ। তারা কীভাবে জানবেন গবেষণার গুরুত্ব বা উৎকর্ষের উপায়? কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানে অন্য রকম। বিগত বিজেপি সরকারের আমলে ভারতীয় সরকারের বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন ভারতের একজন নামকরা বিজ্ঞানী, যিনি ভারতীয় পরমাণু কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং যার বহু গবেষণাপত্র আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান কংগ্রেস সরকারের আমলেও শিক্ষা সচিব তথাকথিত আমলা নন বরং নামকরা বিজ্ঞানী, যার প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা প্রচুর। পাকিস্তানে বর্তমানে যার ওপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, তিনিও একজন ভালো বিজ্ঞানী ও গবেষক।

একইভাবে আমাদের দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনে যে কর্তাব্যক্তিরা নিয়োগ পাচ্ছেন তাদের অনেকেই গবেষণার ব্যাপারে সিরিয়াস ব্যক্তি নন বা ছিলেন না। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের একজন শিক্ষক। আমি যতটুকু জানি, ১৯৮৭ সালের পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞানের কোনো ভালো জার্নাল ক্রয় করে না। আর ভালো জার্নাল ছাড়া গবেষণা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের বিগত ৩২ বছরের ইতিহাস থেকে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু বুঝলাম তা হলো, আর যা-ই হোক বিজ্ঞানের প্রকৃত উৎকর্ষসাধনের প্রয়াস আমাদের রাজনীতিবিদদের মধ্যে নেই। সুতরাং এসব রাজনৈতিক দলের দ্বারা গঠিত সরকারের মধ্যে গবেষণার প্রয়াস থাকবে না, সেটাই স্বাভাবিক। তবে আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশে এখনো অনেক লোক আছেন যারা দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন এবং এর উন্নতি চান। এর প্রমাণ মেলে গত বন্যায় বানভাসি মানুষের জন্য নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে আসা মানুষের মাঝে। আমাদের দেশের কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কি দেশের উন্নয়নের স্বার্থে টাটা কোম্পানির মতো এগিয়ে আসতে পারে না? টাটা ইনস্টিটিউট ফর বেসিক সায়েন্সের মতো একটি ইনস্টিটিউট গড়ে তুলতে পারে না? ১০ বা ২০ বছর পর আমরা দেখতাম, এখানে বসে আমাদের বিজ্ঞানীরা উন্নত বিশ্বের ভালো গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সমপর্যায়ের গবেষণাকাজ করতে পারছেন।

ড. গোলাম মোহাম্মদ ভূঞা : অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

****